Journal of Gono Bishwabidyalay
ISSN: 2521-828X(Print)
2706-9303 (Online)
2706-9311(CD-ROM)
Journal Homepage: https://gonouniversity.edu.bd/research/journal-of-gb/

Review Article

জগদীশ গুপ্তের নায়ক : শুভ-অশুভের দ্বৈত মুখোশ

শামসুন নাহার সেতু[১]*
[১]বাংলা বিভাগ, গণ বিশ্ববিদ্যালয়, সাভার, ঢাকা-১৩৪৪।

* **Corresponding Author :** শামসুন নাহার সেতু; ই-মেইল : setu.bangla44@gmail.com ; Mobile: +8801777-836408|
Received: 19/01/ 2025; Accepted: 26/05/2025; Online Available: 29/05/2025.

সার-সংক্ষেপ

বাংলা সাহিত্যে কল্লোল যুগের পূর্ববর্তী লেখকদের লেখায় একটি মানদণ্ড বা বলয় সৃষ্টি হয়েছিল। যে বলয় বঙ্কিম-রবীন্দ্রবলয় নামে অধিক পরিচিত। কিন্তু কল্লোলের কালে এসে আমরা একঝাঁক প্রগতিশীল লেখককে দেখতে পাই যাঁরা তৎকালীন সাহিত্যের প্রথাকে ভেঙে নতুনকে আহ্বান করেছেন। সে নতুনের জগতে সত্য সুন্দরের বন্দনাই শেষ কথা নয়। তাঁরা দেখাতে চেয়েছেন জীবনের পঙ্কিল-কুৎসিত দিকও একটি অবিচ্ছেদ্য অংশ; যাকে বাদ দিলে জীবন বাস্তবতাবর্জিত থেকে যায়। জগদীশ গুপ্ত (১৮৮৬-১৯৫৭) সেই অন্ধকারাচ্ছন্ন দিককে তুলে ধরেছেন তাঁর কথাসাহিত্যে। কল্লোল যুগের যে বৈশিষ্ট্য আমাদের বহুল পঠিত, তার সব দিক পরিপূর্ণভাবে ফুটে উঠেছে জগদীশ গুপ্তের নায়ক চরিত্র নির্মাণের ক্ষেত্রে। তিনি প্রথম দেখালেন একজন নায়ক হতে পারে শঠ, প্রতারক ও হন্তারক। তবে এই বৈশিষ্ট্যগুলো প্রতিষ্ঠা করতে জগদীশ গুপ্ত বদ্ধপরিকর ছিলেন এমন নয়। তিনি মূলত নিরাবেগ দৃষ্টি দিয়ে দেখাতে চেয়েছেন, নায়ক মানেই তথাকথিত শুদ্ধ-পরিমার্জিত গুণের অধিকারী, এমন না-ও হতে পারে। জীবনের অন্ধকারাচ্ছন্ন দিক যেমন সত্য, তেমনি নায়ক চরিত্রের মধ্যে কপটতা, শঠতা ও আত্মঘাতমূলক প্রবণতাও স্বাভাবিক। তাঁর নির্মাণে নায়ক নায়িকারা একেবারে কাদামাটির মানুষ। যে মানুষের মধ্যে আদিমতা বিরাজমান, আর তা বহিঃপ্রকাশের ক্ষেত্রে জগদীশ গুপ্ত সিদ্ধহস্ত। তাই দেখা যায়, জগদীশ গুপ্তের হিরো চরিত্র নির্মাণের ক্ষেত্রে অ্যান্টি-হিরো চরিত্রের সব বৈশিষ্ট্য প্রতীয়মান।

মূল শব্দ সূচক : *কল্লোল যুগ, সিগমুন্ড ফ্রয়েড, বাস্তববাদ, ন্যাচারালিস্ট, নায়কনির্মাণ, অ্যান্টি-হিরো*

বাংলা কথাসাহিত্যে বঙ্কিমচন্দ্র-রবীন্দ্রনাথ বিশেষ সাহিত্যরুচির পরিচয় দিয়েছেন, যে সাহিত্যরুচি সত্য-সুন্দর, শুভ-কল্যাণ মোটামুটি এ গণ্ডিতে আবদ্ধ। যেখানে জীবনের শুদ্ধতা ও ন্যায়নীতিই শেষ কথা। তাঁরা মূলত সাহিত্যজগতে একটা আবহ সৃষ্টি করতে চেয়েছিলেন। যে আবহ অনেক সময় জোরপূর্বক পুণ্য ও নীতির দিকে মানুষকে ধাবিত করতে চেয়েছে। আর যদি এর বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে কোন বাঁধার সৃষ্টি হয়েছে, তাহলে দেখা গেছে গল্পের নায়ক নায়িকাকে হত্যা করতেও তখন হাত কাঁপেনি লেখকের। উদাহরণ হিসেবে বঙ্কিমের কৃষ্ণকান্তের উইল ও বিষবৃক্ষ উপন্যাসের নায়িকাদের পরিণতি স্মরণ করা যেতে পারে। বিধবা আবার পুরুষসঙ্গ লাভ করলেন এ যেন এক অমার্জনীয় অপরাধ! যার ফলে লেখককে ইতি টানতে হলো নায়িকাদের যথাক্রমে গুলি করে ও বিষ খাইয়ে। পর্যায়ক্রমে এখন আসা যাক রবীন্দ্রনাথ প্রসঙ্গে যিনি বাংলা কথাসাহিত্যে সব্যসাচীর ভূমিকা রেখেছিলেন তিনিও এই বলয় থেকে বের হতে পেরেছেন এমন বলা যায় না। তবে পূর্ববর্তী লেখকদের সঙ্গে তাঁর পার্থক্য এখানে যে তিনি তাঁর বিধবা নায়িকাদের হত্যা করলেন না, পাপের প্রায়শ্চিত্ত করতে পাঠিয়ে দিলেন গয়া কাশী (বিনোদিনী)। অর্থাৎ ধর্মকে আশ্রয় হিসেবে নিয়ে তিনি পাঠককে স্বস্তি দিলেন এবং নিজেও ভারমুক্ত হলেন।

তবে প্রথাগত এই রক্ষণশীল চিন্তাভাবনার জগতে প্রথম যিনি সফলভাবে কড়াঘাত করলেন, তিনি জগদীশচন্দ্র গুপ্ত। যিনি ছিলেন ধরনে ধারণে এই রবীন্দ্র-বঙ্কিমবলয়মুক্ত একজন প্রগতিশীল মানুষ। দেখা যায়, তাঁর গল্পের বিধবা নায়িকা (রতীমঞ্জুরী) পুনরায় বিয়ে করার জন্য পত্রিকায় বিয়ের বিজ্ঞাপন দেন। নারীর সামাজিক অবস্থান বিবেচনায় এই বিষয়টি সেই সময়ে যেমন ছিল বিস্ময়কর, তেমন ছিল দুঃসাহসিক। বিশেষ করে রবীন্দ্র-বঙ্কিম নায়িকাদের সঙ্গে তুলনা করলে বিষয়টি পূর্ণ মনোযোগ দাবি করে। জগদীশ গুপ্তের কথাসাহিত্যের পুনঃপাঠ করলে দেখা যাবে, তাঁর নায়ক নায়িকারা সত্য-সুন্দরের ধারকাছ দিয়ে হাঁটেননি। শুরুতে তাঁরা যেমন সহজ-সরলভাবেই জীবনযাপন করুন না কেন, শেষ পর্যন্ত সবাই কমবেশি নীতিভ্রষ্ট। এ ক্ষেত্রে জীবনের নিষ্ঠুর নির্মম দিক তুলে ধরতে সে সময়ে জগদীশ গুপ্তের কোনো দ্বিতীয় বিকল্প দেখা যায় না। এ কারণেই তিনি মৌলিক ও স্বতন্ত্র। বিশেষ করে নায়ক নায়িকার চরিত্র নির্মাণে জগদীশ গুপ্তকে কোন মোড় পরিবর্তন করতে দেখা যায় না। জীবনের বহুরৈখিক টানাপোড়েন দেখাতে গিয়ে তিনি মানুষের কুৎসিত ও কদর্য দিক একেবারে নির্মোহ দৃষ্টিতে ফুটিয়ে তুলেছেন। যেখানে তাঁর সমসাময়িক লেখকদের লেখায় একটা সুখকর পরিসমাপ্তি দেখা যায়, সেখানে বিপরীত মেরুতে দাঁড়িয়ে জগদীশ গুপ্ত দেখালেন সর্বোপরি মানুষের ওপর বিশ্বাস আস্থা

© Journal of Gono Bishwabidyalay All Rights Reserved

কোনোটাই রাখা যায় না। কারণ, মানুষ জটিল-কুটিল এবং শেষাবধি শান্তিবিমুখ। তাই তথাকথিত সুশীল চিন্তাকে ঝেড়ে ফেলে জগদীশ গুপ্তকে পাঠ করতে হয়।

আসা যাক জগদীশ গুপ্তের উপন্যাস প্রসঙ্গে লঘুগুরু উপন্যাস জগদীশ গুপ্তের প্রথম দিকের উপন্যাস। যেখানে দেখা যায় পতিতার রূপে মোহগ্রস্ত হয়ে তাকে রক্ষিতা করে রাখা, অতঃপর বন্ধুরা মিলে তাকে ভোগ করার বাসনার মতো কদর্য দিক বিশ্বম্ভরের মাধ্যমে ফুটিয়ে তুলেছেন। যদিও বাংলা কথাসাহিত্যে উত্তম চরিত্রের মতো স্বৈরিণীদের নিয়ে লেখা হয়নি এমন না। রাজলক্ষ্মী, রোহিণী এরা তার উৎকৃষ্ট উদাহরণ। যাঁরা বাংলা উপন্যাসে এসেছেন স্বৈরিণীরূপে, রোমান্টিসিজম তথা আবেগের বহিঃপ্রকাশ ঘটাতে। কিন্তু জগদীশ গুপ্তের নায়িকা (উত্তম) যে কিনা পূর্বে গণিকাবৃত্তি করতেন, তিনি উপন্যাসে এক মহৎ নারী চরিত্র। যিনি পেছনের পঙ্কিল অতীতকে ভুলে বিশ্বম্ভরের সংসারে মনোযোগ দেন এবং বিশ্বম্ভর মেয়ে টুকীর আদর্শ মা হয়ে ওঠেন। কিন্তু দেখা যায় রবীন্দ্রনাথের আখ্যায়িত 'কোমরবাঁধা শয়তান' বিশ্বম্ভর যে কিনা শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত একটা লম্পট চরিত্রই থেকে যায়। উত্তমকে ঘরে এনে তাকে দাসীবৃত্তি করানোর প্রবণতা দেখা যায় বিশ্বম্ভরের মধ্যে। কথায় কথায় মেয়ে টুকীর সামনে উত্তমের অতীত জীবন নিয়ে অশালীন মন্তব্য করে সে। ঘটনার একপর্যায়ে এসে প্রতিবেশীর সঙ্গে সুর মিলিয়ে বিশ্বম্ভর ভাবে উত্তম একদিন তার মেয়ে টুকীকে নিয়ে পালিয়ে তার পুরোনো পেশায় গণিকাবৃত্তিতে ফিরে যাবে। বিশ্বম্ভরের বক্তব্য :

> '... একজন বলছে, তুমি নাকি তাকে নিয়ে পালাবে বড় হলে। তুমি যা করতে তাকে দিয়েও তা-ই করাবে, রোজগার করাবে। আর তা যদি না-ও কর, তবু টুকীর বিয়ে দেওয়া যাবে না।' [১]

বিশ্বম্ভরের যে চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য জগদীশ গুপ্ত দেখিয়েছেন, তাতে মেয়েকে মানুষের মতো মানুষ করার মতো দায়িত্বজ্ঞান তার নেই। টুকীর প্রতি তার স্নেহ আছে কি না সেটা নিয়েও যথেষ্ট সন্দেহ করা যায়। কারণ যে পৌঢ় পরিতোষের সঙ্গে তার বিয়ে দেয় বিশ্বম্ভর, তার ঘরেও রক্ষিতা আছে। মূলত বাড়তি টাকার লোভে সে টুকীকে বিয়ে করে। যখন বিশ্বম্ভর জানতে পারে, পরিতোষের রক্ষিতা সুন্দরীর কথা, তখন হেসে উড়িয়ে দিয়ে মেয়েকে পরামর্শ দেয় তার সঙ্গে মানিয়ে গুছিয়ে চলতে। এদিকে মা উত্তম টুকীকে ছোটবেলা থেকে একজন আদর্শ নারী হিসেবে তৈরি করে। টুকী তার স্বামীর প্রতি সব দায়িত্ব পালন করে। অবশেষে জানতে পারে তার বাবার মতো তার স্বামীও ঘরে যাকে রেখেছেন, তিনিও একজন রক্ষিতা। এক মুহূর্তে মায়ের কাছ থেকে পাওয়া সাংসারিক উপদেশ তার কাছে ম্লান হয়ে যায়। তখন মা উত্তমই তার জীবনের একমাত্র উদ্দেশ্য ও আদর্শ হয়ে ওঠে। নিজের বাবা ও স্বামীর প্রতি আস্থা হারিয়ে ফেলে টুকী। তাই উপন্যাসের শেষে দেখা যায়, পরিতোষ আর বিশ্বম্ভরের সঙ্গে তথা কুৎসিত সমাজের সঙ্গে টুকীর মনস্তাত্ত্বিক দ্বন্দ্বের বিরোধিতার অবসান হয় উত্তমের অতীতের পথে হেঁটে।

মানুষের চরিত্রে যে নিকৃষ্ট দিক থাকে এবং তা কতটা নীচ হতে পারে, তা-ই দেখিয়েছেন জগদীশ গুপ্ত। মানুষের ছলনা, হঠকারিতার বীভৎস রূপই যেন তাঁর নায়ক-নায়িকার প্রধান বৈশিষ্ট্য। তারা বেশির ভাগ ক্ষেত্রে সুমহান সুচারু নীতিবিবর্জিত। প্রকৃতপক্ষে মানুষ ইতর ও মনুষ্যত্বহীন এই বৈশিষ্ট্যগুলোই লেখক অনাড়ম্বর ভঙ্গিতে তুলে ধরেছেন। প্রকৃতিবাদী লেখক হিসেবে জগদীশ গুপ্ত এই সমাজবাস্তবতার কথক ছিলেন। বাস্তব প্রকৃতিকে ধারণ করে আশা নিরাশার মধ্যে ঘুরপাক খাওয়া মানুষের রূপ দান করেছেন তাঁর গল্প উপন্যাসে। মূলত তাঁর জীবন ও জগতের অভিজ্ঞতা থেকে চিত্রিত হয়েছে তাঁর নায়ক চরিত্র। জগদীশ গুপ্তের নায়কেরা আদিমতম প্রবৃত্তিকে ধারণ করে একটা 'ভালোমানুষি' মুখোশ পরে ঘুরে বেড়ানো চরিত্র। যে চরিত্র বিধবা শাশুড়িকে সম্ভোগের জন্য তার পাঁচ বছরের কন্যাকে বিয়ে করতেও দ্বিধা বোধ করে না (আদি কথার একটি)। প্রকৃতপক্ষে মানুষ নিজেকে সুশীল-সভ্য দাবি করলেও ভেতরে ভেতরে সে আদিমতাকে ধারণ করে। তাই নারী-পুরুষের সম্পর্ক উপস্থাপন করতে গিয়ে জগদীশ গুপ্ত সমাজবিবর্জিত সম্পর্ক বিষয়ে খোলামেলা আলোচনা করেছেন। গল্পের বিধবা শাশুড়ি কাঞ্চনকে কামনা করছে তার জামাতা সুবল। অল্প বয়সে বিধবা হওয়ার ফলে কাঞ্চনের দিকে সব ধরনের সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেয় সুবল। তার পাঁচ বছরের কন্যাসন্তানের জন্য বিয়ের প্রস্তাব দিলে বিধবা কাঞ্চন কোন উপায় না পেয়ে রাজি হন। মূলত কন্যাদায়গ্রস্ত মায়ের দায়িত্ব পালনের জায়গা থেকে তার এই সিদ্ধান্ত নেওয়া। অতঃপর প্রকাশে আসে সুবলের আসল উদ্দেশ্য। কাঞ্চনকে সে জোর করে সম্ভোগ করে। যেটা পরে জানাজানি হয়ে যায়। কিন্তু সুবলের হাত থেকে কাঞ্চনের নিস্তার নেই। একসময় কাঞ্চন গর্ভবতী হয়ে যায়। গ্রাম্য সালিস বসে। যেখানে অজস্র খড়মপেটা করা হয় কাঞ্চনকে, সারা শরীর তার রক্তাক্ত হয়ে যায়। সবশেষে কাঞ্চনকে গ্রামছাড়া করে দেওয়া হয়।

জামাই-শাশুড়ির এই অবৈধ সম্পর্কের কাহিনি ঘৃণিত সেটা বলার অপেক্ষা রাখে না। কিন্তু মানুষের চরিত্রের কদর্য দিক তুলে ধরতে জগদীশ গুপ্ত সুচারু শিল্পী। আর গ্রামের মানুষের যে বিচারব্যবস্থা তাতে ফুটে উঠে পুরুষতান্ত্রিক সমাজে নারীর অবমাননার বিষয়টি। যেখানে সুবলদের কোন বিচার হয় না, সবাই দোষারোপ করে কাঞ্চনকে। এ ধরনের আখ্যান নির্মাণের প্রবণতা থেকে বলা যায়, জগদীশ গুপ্তের নায়কশ্রেণি যেমন লম্পট, তেমনি লম্পট তাঁর দেখানো সমাজব্যবস্থা।

জগদীশ গুপ্তের নায়ক নায়িকাদের আরেকটি বৈশিষ্ট্য হলো তারা রহস্যবেষ্টিত। সর্বোপরি দেহসর্বস্ব বিষয়-আশয়ে তাদের আগ্রহ প্রবল এবং এদের প্রকাশভঙ্গিও জটিল। নর-নারীর হৃদয়ের গোপন কথা জগদীশ গুপ্ত ফুটিয়ে তুলেছেন যা তাঁর লেখার আরো একটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য। 'অরূপের রাস' গল্পের রাণু ও কানু নামের নায়ক-নায়িকার শৈশবের প্রেমকাহিনি প্রথম দিকে বেশ সরলভাবেই উপস্থাপন করেন লেখক। কাহিনির একপর্যায়ে দেখা যায়, পারিবারিক কিছু জটিলতার কারণে তাদের বিয়ে হয় না। কিন্তু তাদের মধ্যে একটা প্রবল শারীরিক-মানসিক আকর্ষণ গল্পের শেষ পর্যন্ত থেকে যায়।

যে আকর্ষণ পুনরায় জাগ্রত হয় বহু বছর পর। কানুর স্ত্রী ইন্দিরার সঙ্গে রাণুর সম্পর্ক বেশ ঘনিষ্ঠ হয়ে ওঠে। ঘটনাচক্রে একদিন রাতে রাণুর মনের সুপ্ত বাসনা জেগে ওঠে। ইন্দিরাকে উদ্দেশ্য করে রাণু বলে,

'আয় বউ, তুই আর আমি এক হয়ে যাই।' [২]

কানুকে পাওয়ার যে অসম্পূর্ণতা রাণুর, সেটা সে পূরণ করতে চায় ইন্দিরার পাশে রাত কাটিয়ে। জগদীশ গুপ্তের নায়ক নায়িকাদের চাওয়া পাওয়া এ রকম দেহকেন্দ্রিক। যাকে লেখক আড়াল করেননি। একুশ শতকে ফ্রয়েডীয় তত্ত্ব একটি বহুল পরিচিত বিষয়। ফ্রয়েডীয় মনোবিজ্ঞানকে অস্বীকার করার কোনো উপায় নেই – এর মাধ্যমে জৈববাস্তবতাকে তিনি সামনে নিয়ে এসেছেন। কিন্তু কল্লোলের অন্যান্য লেখকের সঙ্গে জগদীশ গুপ্তের পার্থক্য হলো একই বিষয়ে উপস্থাপনরীতি বা বলার ভঙ্গিতে। এই স্বাতন্ত্র্যের বিচার-বিবেচনায় জগদীশ গুপ্তকে বারবার পড়া যেতে পারে। কারণ তিনি মানুষের মনের ক্ষতবিক্ষতের গভীরতা দেখে সিগমুন্ড ফ্রয়েডের তত্ত্বকে সামনে এনেছেন। যিনি সত্যকে সত্য বলেছেন মিথ্যাকে মিথ্যা। কাঞ্চন ও সুবলের এই সম্পর্কের বিষয়ে সিগমুন্ড ফ্রয়েডকে প্রাসঙ্গিকভাবে তুলে এনেছেন জগদীশ গুপ্তের ছোটগল্পের সমালোচক শিপ্রা দে। তাঁর মতে –

"কল্লোল পর্বে ফ্রয়েডের দাপট ছিল যথেষ্ট। যৌনক্ষুধা ও তার সংযম ব্যক্তির জীবনকে জটিল যন্ত্রণাকর ভয়ংকর পরিণতিতে পৌঁছে দেয়। সেই গল্প তিনি নির্মোহ দৃষ্টিতে তুলে ধরেছেন, তখন ফ্রয়েডের ওপর নির্ভরতা তো থাকবেই" [৩] ।

তাই জগদীশ গুপ্তের নায়ক নায়িকাদের নিয়ে কোন ধরনের রোমান্টিকচেতনা সৃষ্টির উদ্দেশ্য ছিল না। বলা হয়, জগদীশ গুপ্ত জনান্তিকের সাহিত্যিক। যিনি কল্পনার ঘোরে আগুন লাগিয়ে মানুষের জীবনের কঠোর কঠিন বাস্তবতাকে তুলে ধরেছেন। তবে এই বাস্তবতা জীবনেরই আরেক রূপ, যাকে কলুষিত রূপ বলা হয়ে থাকে। ভালোর পাশাপাশি মন্দ যেমন সত্য, জগদীশ গুপ্তের নায়ক-নায়িকাদের বেলায় শুভ দিকের পাশাপাশি অশুভ দিকও সত্য। তবে তার চরিত্র নির্মাণের ক্ষেত্রে কল্পনার বাতাবরণ একেবারে ছিল না, এমন না। কিন্তু শেষমেশ জগদীশ গুপ্ত দেখালেন বাস্তবতাই তাঁর লেখার বিশেষ অবলম্বন। এ রকম একটা গল্প 'শশাঙ্ক কবিরাজের স্ত্রী'। যেখানে দেখা যায় শশাঙ্কের বন্ধু সতীশ রোমান্টিক ও ভাবুক স্বভাবের। শশাঙ্কের স্ত্রীর প্রতি তার একটা ভাবাবেগ সৃষ্টি হয়, তবে সেই ভাবাবেগ মোহমুক্ত। সে সব সময় বন্ধুর স্ত্রীর মুখশ্রীর ধ্যানে মগ্ন। সতীশের কল্পনায় শশাঙ্কের স্ত্রী তার কাব্যলক্ষ্মী ও প্রিয়ভাষিণী। কিন্তু জগদীশ গুপ্তের লেখায় পুরুষের এই রোমান্টিকতা বা ভাবালুতার কোন স্থান নেই। সতীশ জানতে পারে, শশাঙ্কের স্ত্রী সন্তানসম্ভবা। তখন এক মুহূর্তের মধ্যে বন্ধুর স্ত্রীর প্রতি তার আবেগ-অনুভূতি ভূপতিত হয়। সতীশ যাকে এই সংসারের বাইরে এক রহস্যময়ী নারী হিসেবে কল্পনা করেছিলেন, গর্ভধারণের খবরে তিনি বুঝতে পারলেন সে ঘর-গৃহস্থালির মধ্যে আবদ্ধ একজন সাধারণ রমণী ছাড়া কিছু নয়।

মূলত জগদীশ গুপ্তের লেখায় পুরুষের কল্পজগৎকে স্থায়ী না করে রোমান্টিকভাব বিবর্জিত করে তুলতে নির্মাণ করেছেন – 'শশাঙ্ক কবিরজের স্ত্রীর নারী চরিত্র'। কারণ, কল্লোল ও কালি-কলম লেখকগোষ্ঠীর মধ্যে রোমান্টিকতার বহিঃপ্রকাশ ছিল না বললেই চলে। বরং তাঁরা রোমান্টিকতার বিরোধিতা করেছেন। যেখানে তিনি দেখিয়েছেন সৌন্দর্য সাধনার নামে কোনো কিছুর স্থায়িত্ব কেবল মানুষের ভাবালোকেই বিদ্যমান। বাস্তব জীবনে মাটিগন্ধী পৃথিবীতে নারী-পুরুষের কামনা বাসনাই যেন শেষ কথা।

মানুষের চাওয়া পাওয়ার মধ্যে কোথাও একটা গোপনীয়তা বিরাজমান বলে ধারণা। নিজের চাওয়া পাওয়াকে প্রাধান্য দিতে গিয়ে মানুষ আত্মগোপন করে স্বার্থসিদ্ধির উদ্দেশ্য। জগদীশ গুপ্তের নায়কদের মধ্যে যেহেতু কোনো শুভ বিষয়-আশয় নেই, তাই তাঁর অসাধু সিদ্ধার্থ উপন্যাসে নটবর নামের ব্যক্তি সিদ্ধার্থ নামকরণ করে বাকি জীবন আনন্দে কাটাতে চায়। জগদীশ গুপ্তের এই সিদ্ধার্থ এক বৈষ্ণবীর ঘরে ব্রাহ্মণের জারজ পুত্র, দোকানের বিনি পয়সার চাকর, যৌবনে টাকার বিনিময়ে এক বৃদ্ধা পতিতার শয্যাসহচর। সে সুদর্শন পুরুষ, যে বিষয়টাকে সে কাজে লাগায় শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত।

অজয়ার সঙ্গে পরিচয়ের পর সিদ্ধার্থ আবিষ্কার করে সে হয়তো অজয়ার প্রেমে পড়েছে। তবু সিদ্ধার্থ তার নিজের পরিচয় গোপন রাখে। পাকা অভিনেতার মতো সে অজয়ার সঙ্গে অভিনয় করে যায় দিনের পর দিন। তবে জগদীশ গুপ্তের সিদ্ধার্থ চরিত্রটি হিরো না হয়ে বরং অ্যান্টি-হিরোর সব প্রবণতাকে ধারণ করে। তাই নায়ক চরিত্রের সব ধরনের শুভ দিক লেখক বর্জন করেছেন। জগদীশ গুপ্তের নায়ক চরিত্র সিদ্ধার্থ তার নামকরণের মতোই 'অসাধু'। যে শুরু থেকে তার মায়ের অকালে মারা যাওয়ার বিষয়টা বারবার অজয়াকে বলে তার সহানুভূতি পেতে চায়। যখন সে সহানুভূতি পায়, তখন নিজের পাতা ফাঁদের কৌশল দেখে নিজেই নিজেকে বাহবা দেয়। একপর্যায়ে দেখা যায়, সিদ্ধার্থ অজয়াকে ভালোবেসে ফেলে (হয়তো)। তবে তার ভালোবাসার মধ্যে আর্থিক লোভ

লালসা বিদ্যমান। তবে অজয়াকে পাওয়ার জন্য তাকে বিচিত্র সব রূপ ধারণ করতে দেখা যায়। সব সময় দোলাচলে ভুগতে থাকা সিদ্ধার্থ মাঝে মাঝে ভাবে অতীতের সব পাপাচার অজয়াকে ভালোবেসে সে পুণ্যে পরিণত করবে। কিন্তু পাপের বেড়াজাল থেকে শেষমেশ তার মুক্তি নেই। সিদ্ধার্থের ক্লেদান্ত অতীত উপন্যাসের শেষে ফাঁস হয়ে যায়। সিদ্ধার্থ নামে ছদ্মবেশী যুবক আসলে কে। এই যুবকের মাধ্যমে লেখক দেখিয়েছেন মানুষ তার জীবনের উন্নতি সাধনের উদ্দেশ্যে যেকোনো রূপ ধারণ করতে দ্বিধাবোধ করে না; বরং বিবেক বুদ্ধিকে চুলোয় দিয়ে তার স্বার্থ হাসিল করা চাই। তবে আরেকটি বিষয় এখানে উল্লেখযোগ্য। তা হলো জগদীশ গুপ্তের নায়কেরা শেষ পর্যন্ত ভালোর দিকে নিজেকে নিয়ে যেতে ব্যর্থ হয় সেটা যেন নিয়তি-নির্ধারিত, যা অলঙ্ঘন করা মানুষের পক্ষে সম্ভব নয়। জীবনের অশুভবোধ অনিবার্যভাবে তাদের আষ্টেপৃষ্ঠে ধরে। সেই নিয়তিই হয়তো তাঁর নায়কদের 'ভালো মানুষ' হতে দেয় না। মনে হয় মানুষ কোন না কোনোভাবে অদৃশ্য অপশক্তির কাছে মানুষ-পুতুলে পরিণত হয়। তাই তাঁর নায়ক নায়িকারা হিরো না হয়ে অ্যান্টি-হিরোই থেকে যায়।

রবীন্দ্র-বঙ্কিম সাহিত্যে সাধারণত ভাববাদ ও মানবতাবাদের পরিচয় পাওয়া যায়। যাতে দেখানো হয় তাঁদের নায়ক চরিত্ররা আদর্শবাদী, সত্যনিষ্ঠ ও ভোগবিলাসহীন। সে সময়ে যার প্রভাবমুক্ত হওয়া বেশ কঠিন কাজ। নায়ক চরিত্র বলতে আমাদের চোখে যে হিরোইজমের স্কেচ ভেসে ওঠে, জগদীশ গুপ্ত সেই জায়গায় আপাদমস্তক ব্যতিক্রম। তাঁর কোনো নায়ক চরিত্রকে কল্পনায় হাবুডুবু খেতে দেখা যায় না। জীবনের যে দিকগুলো নিয়ে আমরা সাধারণত আলোচনা করতে চাই না; গোপন রাখতে চাই অথবা আড়াল রাখতে চাই সেগুলোই জগদীশ গুপ্তের নায়কদের মৌলিক বৈশিষ্ট্য। মানুষের এই অলঙ্ঘনীয় অতৃপ্তিকর কদর্য দিক যে অনিবার্য সত্য, ঘুরেফিরে লেখক তা-ই বোঝাতে চেয়েছেন তাঁর নায়ক চরিত্রের মধ্য দিয়ে। এ প্রসঙ্গে নিরঞ্জন চক্রবর্তীর একটি মন্তব্য উল্লেখযোগ্য :

> 'সৎ মানুষ সততার পথ খোঁজে, ভিলেন ভিলেন হবার পদ্ধতি খোঁজে। প্রকৃতিবাদী সাহিত্যিকেরা দস্যু রত্নাকরকে বাল্মীকি বানাতে প্রয়াসী নয়। শিবত্বও মানুষের চারিত্রিক লক্ষণ, পশুত্বও তা-ই' [৪]।

একইভাবে দেখা যায়, সিদ্ধার্থের জীবনে অ্যান্টি-হিরোর যত বৈশিষ্ট্য দেখা যায়, তাতে মনে হয় ভিলেন হওয়াই যেন তার জীবনের একমাত্র উদ্দেশ্য। আপাতদৃষ্টিতে এ ধরনের প্রবণতাকে মানুষের মস্তিষ্কের নিভৃততর জটিলতার বহিঃপ্রকাশই বলা যেতে পারে। তবে নায়ক নায়িকাদের জটিল বিষয় তথা সব ধরনের নিষ্ঠুরতাকে জগদীশ গুপ্ত নির্বিকারভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন। বলা যেতে পারে, তাঁর নায়ক নায়িকাদের উপস্থাপনে তিনি রাঙিয়ে তোলার বিষয়কে টানতে চাননি। তাই তাঁর নায়ক চরিত্র বেশ অনাড়ম্বর, কিন্তু আকর্ষণীয়। আকর্ষণীয় এই অর্থে যে সিদ্ধার্থের মতো নায়ক চরিত্র বাঁচার তাগিদে সর্বোপরি আত্মরক্ষার জন্য নিরুপায় হয়ে সার্বক্ষণিক দ্বন্দ্বে ভোগে। যাকে মানবজীবনের নির্মম অসহায়ত্ব বলা যেতে পারে। যে অসহায়ত্বের কোন শেষ নেই, যা মানুষকে টেনে নিয়ে যায় অনির্দেশে। যেখানে দেখা যায় সিদ্ধার্থের এই অসমতলতা আজন্মের; যার কোনো মীমাংসা নেই। ভীষ্মদেব চৌধুরীর মতে :

> তার নর-নারী সমাজ অন্তর্গত হয়েও প্রচলিত সমাজ থেকে বিচ্ছিন্ন, নিঃসঙ্গ। এই বিচ্ছিন্নতা ও নৈঃসঙ্গ্যতা অধিক চরিত্রকে করেছে প্রমত্ত। এবং তাদের আসক্তি-উন্মাদ কদর্য জীবনাচারে ইন্ধন যুগিয়েছে তাদের অদৃষ্টবাদী জীবনবোধ। অদৃষ্টবাদী মানুষ অনিবার্যভাবে হয়ে ওঠে স্বৈরাচারী নায়ক [৫]।

অনেকেই জগদীশ গুপ্তকে নৈরাশ্যবাদী পরাজয়ের অবিমিশ্র কথক বলেন; যা একবাক্যে বলাও সহজ নয়। জীবনের অন্তরালের দিকে তাঁর দৃষ্টি ছিল এটা অস্বীকার করার কোনো উপায় নেই। যেদিকে সাধারণত মানুষ নজর দিতে চান না অথবা অনালোচিত রাখতে চান। জগদীশ গুপ্ত তাঁর নায়ক নায়িকাদের মাধ্যমে জীবনের এই অনালোচিত দিকগুলোর বহিঃপ্রকাশ দেখাতে চেয়েছেন। যেখানে পাত্রপাত্রীদের প্রতি তাঁর সেই অর্থে সহানুভূতি বা পক্ষপাতিত্ব নেই। সিদ্ধার্থ নামের নটবরের চরিত্র নির্মাণে শেষমেশ তার অসহায়ত্ব এমনভাবে দেখানো হয়েছে, যেন এটাই তার জীবনের স্বাভাবিক ঘটনা। সাধারণত দেখা যায়, নায়ক চরিত্র নির্মাণে লেখকের পক্ষপাতিত্ব থাকে, যে পক্ষপাতিত্ব পাঠককে শান্তি দেয়। কারণ, অনেক সময় পাঠকের কাছে নায়ক মানেই শৌর্য-বীর্যের প্রতীক ও নায়ক কোনো অসাধু কাজে লিপ্ত হতে পারে না। শেষ পর্যায়ে নায়ক সব প্রতিকূলতার মধ্য দিয়ে জয়লাভ করে। নায়কের এই জয়লাভ দেখানোর পেছনে একধরনের স্বস্তিদায়ক মনস্তত্ত্ব কাজ করে। জীবনযুদ্ধে হেরে যাওয়া মানুষেরা এই গল্পের নায়কের মধ্য দিয়ে যেন নিজেরা জয়লাভ করে। প্রত্যেক মানুষ তাঁর জীবনসংগ্রামে একজন সফল নায়ক হিসেবে কল্পনা করতে স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করেন। সেখানে দেখা যায় রতিমঞ্জুরী, রাণু, সিদ্ধার্থ, বিশ্বম্ভর ও সুবলরা বিপরীতধর্মী নায়ক নায়িকা। জীবনে চলার পথে তাঁরা কোন না কোন পাপকাজে জড়িত অথবা নিয়তিতাড়িত। বলে রাখা দরকার, জগদীশ গুপ্তের নায়ক চরিত্র নির্মাণে আরেকটি বিষয় লক্ষণীয়, সে সময়ের পাঠকদের কাছে এই সিদ্ধার্থই প্রথম যিনি একজন পৌরুষ বিক্রেতা। জীবনের একটা লম্বা সময় তিনি একজন বিধবার শয্যাসহচর ছিলেন। এ ঘটনাকে কেন্দ্র করে তিনি আখ্যানে আরো পরিবর্তন আনতে পারতেন বা বিশদ আলোচনা করতে পারতেন।

বোধ করি এটা তাঁর উদ্দেশ্য ছিল না। যার ফলে এই কাহিনির উপস্থাপনায় কোনো অতিরঞ্জিত বিষয় নেই জগদীশ গুপ্তের। তবে বাংলা সাহিত্যের নায়ক নির্মাণে আনন্দদায়ক মনোরম গণ্ডি থেকে বের হয়ে তিনি সাহসিকতার পরিচয় দিয়েছেন, এতে কোনো সন্দেহ নেই।

কল্লোল পূর্ববর্তী লেখক যেখানে চাঁদের সৌন্দর্য খুঁজতে ব্যস্ত, সেখানে জগদীশ গুপ্তের চাঁদের ক্ষত-বিক্ষত দিকটির দিকে নজর বেশি। দূর থেকে চাঁদের আলো দেখে সুখ অনুভব করার চেয়ে তিনি কাছে গিয়ে ক্ষতকে টেনে আনতে চেয়েছেন। যার ফলে রোমান্টিক ভাবকে ঝেড়ে ফেলে তিনি কালো মানুষকে কালোই এঁকেছেন, তার ওপরে কোনো রঙের প্রলেপ দেওয়ার প্রয়োজন বোধ করেননি বা দেখাতে চাননি। কারণ, এই 'কুৎসিত' মানুষেরা আমাদের সমাজে বিরল নয়; বরং আমাদের চারপাশেই এদের বসবাস। কিন্তু মানুষ সাধারণত নিজেকে তথাকথিত 'সুসভ্য' দেখানোর লক্ষ্যে তার কুপ্রবৃত্তিগুলোকে ছাইচাপা দিয়ে রাখে। তবে সুচরিত্র তাঁর লেখায় বিরল বলে অনেকেই মন্তব্য করে থাকেন। কিন্তু লক্ষ করলে দেখা যাবে, অজয়ার সঙ্গে নটবরের (সিদ্ধার্থ) বিয়ে হবার একেবারে কয়েক মুহূর্ত আগে অজয়ার মাতামহ সিদ্ধার্থর সত্যিকার পরিচয় জানান। লেখক চাইলে এই আবিষ্কারকে বিয়ের পরে উদ্‌ঘাটন করতে পারতেন। কিন্তু তিনি তা করেননি। কারণ, অজয়া সিদ্ধার্থকে ভালোবেসেছিল সত্যি সত্যি। সেই ভালোবাসার জায়গাকে লেখক নষ্ট করতে চাননি। তাই অজয়াকে তিনি একধরনের বাঁচিয়ে দেন ক্লেদান্ত জীবনের ভার বহনের জায়গা থেকে। প্রসঙ্গক্রমে বলা যায়, লঘু-গুরুর উত্তম চরিত্র নির্মাণে জগদীশ গুপ্ত দেখিয়েছেন গণিকাবৃত্তি উত্তমের অতীত ইতিহাস হলেও বিশ্বম্ভরের সংসারে এসে একজন উৎকৃষ্ট নারীতে তিনি পরিণত হন। একই সঙ্গে মেয়ে টুকীকে মানুষের মতো মানুষ করেন। টুকী তার নিজের সন্তান না, এটা জেনেও তার ভালোবাসার কোনো কমতি উপন্যাসের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত দেখা যায় না। এ বিষয়গুলো বিবেচনা করলে দেখা যায়, তিনি নৈরাশ্যবাদী লেখক বলে যে মন্তব্য করা হয়, তা সঠিক নয়। প্রকৃতপক্ষে তিনি যে বিষয়টি প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছিলেন বলে মনে করা হয়, সেটা হলো ভালো-মন্দ মিলিয়ে মানুষ। এটাই জীবনের স্বাভাবিক দিক। আর তাঁর নায়ক চরিত্ররা ভালো-মন্দের ঊর্ধ্বে কিছু নয়। অতএব মানুষের ভালো দিকগুলো দেখানো হলেই তাকে নায়ক-নায়িকা আখ্যা দেওয়া যায় না। বরং মানুষের অন্তরালের কুপ্রবৃত্তির দ্বারা মানুষ তাড়িত; যাকে অস্বীকার করার উপায় নেই, এই প্রবণতাও নায়কের বৈশিষ্ট্য হতে পারে।

বঙ্কিম-রবীন্দ্র সময়ের গল্প উপন্যাসের নায়ক নায়িকাদের সাধারণত জমিদারবাড়ির অন্দরমহলে দেখা যেত। তাই বলা যায়, তারা গণমানুষের নায়ক নায়িকা হতে পারেনি। অপরদিকে কল্লোলের কবি-সাহিত্যিকেরা প্রথম এই অন্দরমহলের বাইরে তাঁদের নায়ক নায়িকাদের নিয়ে এলেন; ভাঙতে চাইলেন সব রকমের সামাজিক বাধা। পুরোপুরি সেই প্রচলিত প্রথাকে ভেঙে ফেলা হয়তো তাঁদের পক্ষে সম্ভব হয়ে ওঠেনি। তবে যাঁরা এই প্রথার বিপক্ষে বিপরীত অবস্থান নিয়েছিলেন, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় ছিলেন তাঁদের মধ্যে অগ্রগামী। তবে পুরোপুরিভাবে যে লেখক কল্লোলের কালকে ধারণ করেছেন এবং তার বহিঃপ্রকাশ ঘটিয়েছেন, তিনি জগদীশ গুপ্ত। এ ক্ষেত্রে তাঁর পূর্বসূরি বা উত্তরসূরি সেই অর্থে পাওয়া যায় না। সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায় বলেছেন :

> 'জগদীশ গুপ্ত কল্লোলের কালবর্তী এবং সঙ্গে সঙ্গে একথা সত্য যে কল্লোলের যা মূল বৈশিষ্ট্য হওয়া উচিত, তা একমাত্র জগদীশ গুপ্তের রচনাতেই অভিব্যক্ত' [৬]।

তাঁর গল্প উপন্যাসের কোনো চরিত্র জমিদার বাড়ির ধারেকাছে ঘেঁষেনি। তাঁর নায়ক নায়িকারা স্বভাবে পল্লীকেন্দ্রিক। তার চেয়ে বড় বৈশিষ্ট্য হলো তিনি দেখালেন মানুষের স্বভাবের কুশ্রীতা, নীচতা, ইতরতার টোপ মানুষকে কীভাবে গিলে ফেলে। ফলে নায়ক আর খলনায়কের পার্থক্যের মধ্যে একটা দ্বন্দ্ব সৃষ্টি হয়। যে দ্বন্দ্বের সমাধানের পথ অর্থাৎ কে নায়ক হবেন আর কে ভিলেন; সে সিদ্ধান্ত পাঠকের হাতে ছেড়ে দিয়েছেন জগদীশ গুপ্ত।

জগদীশ গুপ্ত নায়ক নায়িকা নির্মাণে বঙ্কিম-রবীন্দ্রনাথ-প্রভাতকুমার-শরৎচন্দ্রের সাহিত্য আবহাওয়ার বিপরীতে প্রথম ও সার্থক কথাসাহিত্যিক। বলা যেতে পারে কল্লোলের কোলাহলের মধ্যে তিনি এসেছিলেন নিভৃতে, তবে যথেষ্ট প্রাচুর্য নিয়ে। যে প্রাচুর্যকে মেনে নিতে প্রথম প্রথম একটু ধাক্কা লেগেছিল বাঙালি পাঠকের। এ বিষয়ে পবিত্র সরকার মন্তব্য করেছেন :

> 'আমাদের সাহিত্যের স্বাদুপথবিলাসী পাঠককুল তাঁকে কখনোই পুরোপুরি হজম করতে পারেনি, বরং তিনি বেশ কিছুটা পার্শ্বিকতায় নির্বাসিত হয়ে আছেন' [৭]।

তাঁর জীবনযাপনের দৃষ্টিই ছিল তাঁর নায়ক প্রতিষ্ঠার একটি বড় স্তম্ভ। জীবনের ঘটে যাওয়া ভালো-মন্দ দুটি বিষয়ই তিনি তাঁর চরিত্রের মাধ্যমে দেখাতে চেয়েছেন। যেখানে নেই কোন বাল্যখিল্যতা, নেই কোনো কল্পনাশ্রয়ী সুখকর বিষয়। রবীন্দ্রনাথ যেখানে বলেছেন মানুষের ওপর বিশ্বাস হারানো পাপ। সেখানে জগদীশ গুপ্ত দেখালেন মানুষকে শতভাগ বিশ্বাস করা যায় না। কারণ, ভালো দিকের মতোই মানুষের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য হলো তার কদর্য দিক। তবে এভাবে নায়ক চরিত্র নির্মাণের ক্ষেত্রে জগদীশ গুপ্ত কারো বিরুদ্ধাচরণ করেননি। তাঁর শান্ত স্বভাবের মতোই তাঁর নির্মাণরীতিও শান্ত, স্থির।

পরিশেষে বলা যায়, প্রত্যেক লেখকই স্বতন্ত্র যেমন স্বতন্ত্র প্রত্যেক মানুষ। সেদিক থেকে জগদীশ গুপ্তের দেখার দৃষ্টি ছিল ব্যতিক্রম, যাকে আমরা বলতে চাই বাস্তবসম্মত, প্রকৃতিবাদী ইত্যাদি। তিনি যেমন মানুষ নির্মাণ করেছেন একই সঙ্গে নির্মাণ

করেছেন 'অমানুষকে'। সেখানে তিনি কোনো ধরনের কাল্পনিক গুণাবলি প্রতিষ্ঠিত করতে চাননি। তিনি নায়ক চরিত্রদের মাটিতে গড়া ভালো-মন্দের মিশেলে মানুষ হিসেবে সৃষ্টি করেছেন। যে সৃষ্টি তাঁকে কল্লোলের কাল থেকে শুরু করে একুশ শতকে এসেও পাঠকমহলে অধিক মর্যাদা দিয়েছে।

গ্রন্থপঞ্জি ও তথ্যসূত্র

১. জগদীশ গুপ্তর গল্প, সুবীর রায় চৌধুরী (সম্পাদক) ১৯৭৭, দে'জ পাবলিশিং, ১৩ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট, কলকাতা। পৃ. ২৭

২. জগদীশ গুপ্তর গল্প, সুবীর রায় চৌধুরী (সম্পাদক) ১৯৭৭, দে'জ পাবলিশিং, ১৩ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট, কলকাতা। পৃ. ১২৪

৩. ছোটগল্পের অর্কিড : জগদীশচন্দ্র গুপ্ত, শিপ্রা দে, নারায়ণ ঘোষ, অক্ষর প্রকাশনী, ১৮ এ, টেমার লেন, কলকাতা। পৃ. ১৩

৪. জগদীশ গুপ্তর গল্প, সুবীর রায় চৌধুরী (সম্পাদক) ১৯৭৭, দে'জ পাবলিশিং, ১৩ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট, কলকাতা। পৃ. ৪৯৭

৫. জগদীশ গুপ্তের গল্প পঙ্ক ও পঙ্কজ, ভীষ্মদেব চৌধুরী (১৯৮৮), ফুলদল প্রকাশনী, ৩৮ প্রি স্কুল স্ট্রিট, হাতিরপুল, ঢাকা। পৃ.৫৯

৬. বাংলা উপন্যাসের কালান্তর, সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায় (২০১২), দে'জ পাবলিশিং, ১৩ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট, কলকাতা। পৃ. ২২৮

৭. সেরা জগদীশ গুপ্ত (উপন্যাসখণ্ড), অপর্ণা বসাক, সংকলক সরসিজ বসু, তথাগত প্রকাশনী, জানুয়ারি ২০২২, ৯১/ বি বৈঠকখানা রোড, কলকাতা ৭০০০৯। পৃ. (মুখবন্ধ) : ২